মহাকাশ বার্তা

৩৬ সংখ্যা ❐ মে - জুলাই ১৯৯৮

[বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশন-এর প্রকাশনা]

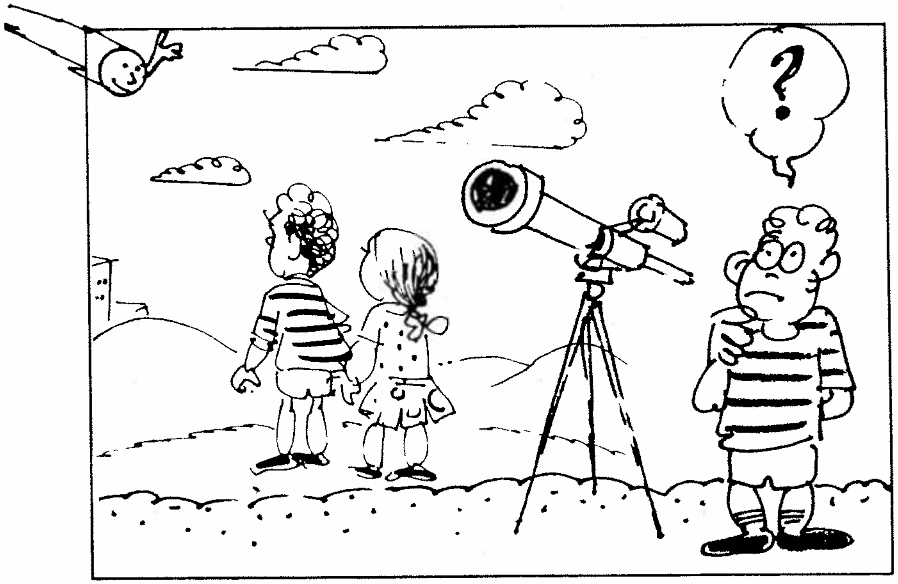

আকাশের কথা, মহাকাশের কথা জানার জন্য ছোটদের আগ্রহ অপার। সে তুলনায় এ বিষয়ে লেখা হয় খুব কম। জ্যোতির্বিজ্ঞানের মজার খবরগুলো ছোটদের উপযোগী করে উপস্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে 'মহাকাশ বার্তা'। গত কয়েক সংখ্যায় ছোটদের উপযোগী লেখা 'ক্ষুদে পন্ডিতদের প্রবেশ নিষেধ!' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। সেই ধারাবাহিক লেখাগুলোর সাথে এ সংখ্যায় আরও একটি লেখা যুক্ত হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাথমিক অ আ ক খ দিয়েই প্রচ্ছদ কাহিনী সাজানো হয়েছে।

ছোটদের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান – মোনালিসা রহমান-২৭
জ্যোতির্বিজ্ঞানের মজা ঃ ৪ – মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম-৪৩
পদার্থ বিজ্ঞানের মজার ঘটনা ঃ ৫ –মারুফ বিন আলম-৪৬
পদার্থ বিদ্যার প্রথম পাঠ ঃ ৩ – মুহম্মদ জাফর ইকবাল-৫১

স্মৃতিময় ছায়াপথিকেরা

সুইফ্‌ট টাটল ঃ মৃত্যুর ধূমকেতু–আশীক নূন-৫৯

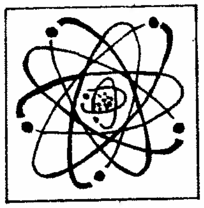

জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞান

প্লাজমা ফিউশন ও মহাকাশ বিজ্ঞান–ডঃ মফিজউদ্দিন আহমেদ-৭৯

বুধ ঃ বিস্মৃত গ্রহ – দেওয়ান মাসুদ করিম-৭
লুনার প্রসপেক্টর অভিযান– শুক্লা সায়ন্তন-৬৭
নাক্ষত্রিক গঠন ও বিবর্তন–প্রকৌশলী সুকল্যান বাছাড়-৭১
শ্রীনিবাস রামানুজন ঃ বিস্ময়কর এক গণিত প্রতিভা –শ্রী সুজন কুমার দেব-৮৮
জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্যোতিষ্মান তথ্য – আলীফ হোসেন-৯৩
তারার ছবি ঃ ৪–পারভেজ মনন-১০০
আর্থার সি. ক্লার্কের সাথে–শরীফ মোস্তাফিজুর রহমান-১০৩
অ্যাস্ট্রোনমি সফটওয়ার –১০৭
জ্যোতির্বিজ্ঞান শব্দকোষ–ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী-১১০
দূর পৃথিবীর ডাক-আর্থার সি. ক্লার্ক-১১৩
পর্যবেক্ষকদের পাতা–সৈয়দ আশরাফ উদ্দিন-১২২
দশ বছর আকাশে নজর–১৩৩
জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্যালারী–১৩৭
তথ্যাণু–১৩৯
বিপন্ন পৃথিবী ঃ মহাকাশ আশ্রয়স্থল–এফ. আর. সরকার-১৫২
সংগঠন সংবাদ–১৫৬
বই পরিচিতি-১৫৭
ডাকঘর-১৫৮

[আলোকচিত্র সৌজন্য ঃ JPL. NASA, SKY AND TELESCOPE, ASTRONOMY, মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা]

FOR A MODERN TANNERY UPTO FINISH UNIT AND
COMPLETE PLANT MACHINERY & COMPONENT
OF SHOE PROJECT

PLEASE CONTACT
unidev ltd.
DCCI BUILDING (5TH FLOOR)
65-66, MOTIJHEEL C/A
DHAKA, BANGLADESH
PHONE: 9567875, 9550419 FAX: 9567876

We are specialsed in supply and services of Leather processing machines and chemicals in Bangladesh supplied innumerable machines to almost all the leading tanneries producing crust and finished leather, on behalf of world renowned tannery machine manufacturers from Europe. Besides the tannery machines we are also in the field of turnkey services for supply of Leather shoe making unit and shoe components on behalf of world's most experienced supplier from Italy.

We are proud to mention herebelow the world leaders in leather field for whom we are working as an exclusive agent in Bangladesh.

MERCIER TURNER
TANNING MACHINERY

FINVAC
VACUUM DRYER

CO.MA.R. s.r.l.
RECONDITIONED & NEW
TANNING MACHINERY

TORIELLI S.p.A
SHOE MACHINERY

For Chemicals

CAM PAZARLAM A.S.
BASIC CHROMIUM SULPHATE (TANKROM)
SODIUM-BI-CHROMATE

FORESTAL QUEBRACHO LTD.
VEGETABLE TANNING EXTRACT
UNITAN ATO

বুধ ঃ বিস্মৃত গ্রহ

দেওয়ান মাসুদ করিম

প্রাচীনকালের লোকেরা সূর্যাস্তের সময় একটি উজ্জ্বল তারা পশ্চিম আকাশে দেখতে পেত। তবে এর স্থান পরিবর্তনের ধরণ দেখে তারা সন্দেহ করেছিলো যে, এটি কোন সাধারণ তারা নয়। কোন কিছুকে কেন্দ্র করে ঘোরার প্রবণতা দেখে তারা বুঝেছিলো যে, এটি গ্রহ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। সূর্য ছিল তাদের পূজনীয় দেবতা এবং বুধ হচ্ছে সূর্যের সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ, তাই তারা এর নাম দিল দেবতাদের বার্তাবাহক (Mercury-Greek name)। পরে অবশ্য তারা পূবের আকাশেও এই গ্রহকে দেখতে পেয়েছিল। ছলনাময়ীর মত পালিয়ে বেড়ানো এই গ্রহকে সৌখিন জ্যোতির্বিদদের পক্ষে পর্যবেক্ষণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এমনকি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাসও গ্রহটি কখনোই দেখতে পারেননি। একবার বিজ্ঞানী প্যাট্রিক মুর একটি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। পরীক্ষাটি হলো বছরে কতবার বুধ গ্রহকে দেখা সম্ভব। মাত্র সতেরবার গ্রহটিকে দেখতে পাওয়া গেছে, আর শহরের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে এ সংখ্যাটি আরও কমে যাবে।

সূর্যের দিকে বুধই হচ্ছে আমাদের সৌরজগতের শুরু। প্রাক সৌর নীহারিকা থেকে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়েছে তাদের মাঝে বুধ সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রায় তৈরী হয়েছে। বুধের ভোর থেকে গোধূলি হওয়া পর্যন্ত সময় লাগে পৃথিবীর হিসাবে ১৭৬ দিন, যা সৌরজগতের গ্রহগুলোর বছরের তুলনায় দীর্ঘতম দিন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, যখন বুধ অনুসূর বিন্দুতে (কক্ষপথে সূর্যের সবচেয়ে নিকটতম বিন্দু) অবস্থান করে তখন কেপলারের সূত্রানুসারে এর গতি বেড়ে যায়, যার ফলে বুধের পিঠে দাঁড়ানো কোন ব্যক্তি সূর্যকে আকাশে উদিত হওয়ার পর আবার পেছনে ফিরে যেতে দেখবে এবং গ্রহের গতি স্বাভাবিক হওয়ার পর আবার সূর্যকে সামনে এগিয়ে যেতে দেখবে। দিনে এর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা 700^0K-এ পৌঁছায় যা অন্য যে কোন গ্রহের পৃষ্ঠতাপের চেয়ে বেশি (এই তাপে সীসাও গলে যায়), আর রাতে তাপমাত্রা নামে 100^0K (যা নিষ্ক্রিয় গ্যাস ক্রিপ্টনকে হিমায়িত করার জন্য যথেষ্ট)।

বুধের এরকম অস্বাভাবিক আচরণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সবসময় কৌতুহল জাগিয়েছে এবং সত্যিকার অর্থে গ্রহটি যে কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য এক কঠিন স্থান। এর পরম বৈশিষ্ট্যের জন্য একে সৌরজগতের উৎপত্তির বিভিন্ন তত্ত্বের সাথে তুলনা করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে বস্তুত বুধের এ ধরণের আরোপিত আচরণের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন তত্ত্ব ও পরীক্ষাকে আরও সূক্ষ্ম ও নির্ভুলভাবে পুনরায় নির্ণয় করতে হয়েছে। তারপরেও গ্রহের বিভিন্ন তথ্যের প্রাপ্যতার দিক থেকে একে মঙ্গল ও শুক্র গ্রহের পরেই স্থান দেয়া হয়েছে এবং এই তালিকার সর্বশেষ স্থানে

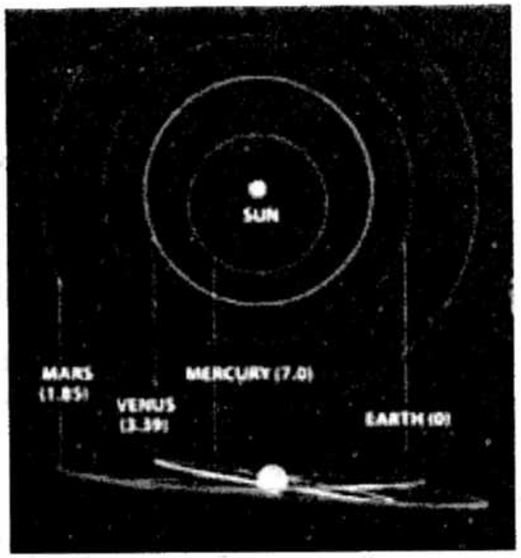
SUN
MARS (1.85)
VENUS (3.39)
MERCURY (7.0)
EARTH (0)

পেছনের কথা

এখন এটা প্রতিষ্ঠিত যে, বুধের চেয়ে সূর্যের কাছে আর কোন গ্রহ বা বস্তু নেই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেকেই মনে করতেন গ্রহাণু (ইকারাস) এবং কতগুলো ধুমকেতু ছাড়া অন্য একটি গ্রহ বুধ ও সূর্যের মাঝে রয়েছে। এক শতাব্দী আগে আন্তঃবুধ গ্রহ (বুধের চেয়েও সূর্যের কাছের বস্তুকে আন্তঃবুধ নাম দেয়া হয়েছিল।) আছে বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন এবং এর প্রমাণও তারা পেয়েছেন বলে দাবী করতেন, এমনকি এই গ্রহের নামও দিয়েছিলেন 'ভলকান', এই গ্রহ 'আবিষ্কারের' কাহিনীও খুবই চমৎকার এবং অত্যন্ত মেধাবী বিজ্ঞানীরাও যে মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে ফেলেন, এই ঘটনাটি তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

সে সময় প্যারিস অবজারভেটরীর পরিচালক ছিলেন লা-ভেরিয়ার, তার সময়ে তিনিই সম্ভবত বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন কারণ তিনি ব্যক্তিগতভাবে একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কারে অবদান রেখেছিলেন যা আমাদের জানা সৌরজগতের সীমানাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তখন পর্যন্ত আবিস্কৃত গ্রহগুলোর মধ্যে ইউরেনাস ছিল সবচেয়ে দূরবর্তী যার চালচলন ঠিকভাবে নিউটনের তত্ত্বের সাথে মিলছিল না, মনে হচ্ছিল কেউ যেন একে তার কক্ষপথ থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভেরিয়ার হিসাব -নিকাশ করে দেখালেন এই অনিয়মের পেছনে রয়েছে কাছাকাছি উপস্থিত কোন গ্রহ, যাকে আমরা নেপচুন নামে চিনি। (এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা মহাকাশ বার্তা ৩৩ সংখ্যায় রয়েছে)। এই সাফল্যের ১৫ বছর পর ১৮৬০ সালে লা-ভেরিয়ার বুধ সম্পর্কে প্রায় একই সিদ্ধান্তে পৌছলেন ঃ দেবতার বার্তাবাহক, যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই, তাই স্বাভাবিকভাবে, ইউরেনাসের মত এক্ষেত্রেও তিনি অনুমান করলেন যে, এই অনিয়মের কারণ হল আন্তঃবুধ কোন গ্রহের আকর্ষণ। কিন্তু আসলে ঘটনাটির মূল ছিল অন্য জায়গায়। বহু বছর পর আইনস্টাইন দীর্ঘদিন যাবত অমিমাংসিত বিষয়টির সমাধান করেন কোন গ্রহের অজানা গ্রহের প্রভাব বিবেচনা না করেই। আমরা জানি আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য যতগুলো পরীক্ষা তাকে দিতে হয়েছিল এটি তারই সেই সাফল্যের অন্যতম একটি ঘটনা। যাহোক এরই মাঝে, লা-ভেরিয়ারের হিসাবের পর, ফ্রান্সের এক ডক্টর লেসকারবল্ট তাকে জানান যে তিনি সূর্যের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় আন্তঃবুধ গ্রহটিকে দেখতে পেয়েছেন। আন্তঃগ্রহ বুধ ও শুক্র-এর আন্ত-সংযোগ (Inferior conjunction) এর সময় অবশ্যই সূর্য বিম্ব অতিক্রম করবে তাই এরকম কোন গ্রহ যদি থেকে থাকে তবে তা পর্যবেক্ষণের সুবর্ণ সুযোগ হচ্ছে এই ধরণের কোন বিশেষ সময়। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও এ ধরণের কোন কিছু দেখা গেলানা। এমনকি লেসকারবল্টের পর্যক্ষেণের একই সময়ে ব্রাজিলের লিয়ায়িস নামে এক ব্যক্তি তথাকথিত গ্রহের ট্রানজিট দেখতে পাননি বরং সেখানে কিছু সৌরকলঙ্ক দেখা গিয়েছিল। অবশেষে ১৮৭৮ সালে পূর্ণসূর্যগ্রহণের সময় আমেরিকান পর্যবেক্ষক ওয়াটসন ও সুইফট কিছু বস্তু সূর্যবিম্বে দেখতে পান যদিও তা বর্ণিত 'ভালকান বা রূপকথার গ্রহে'র সাথে কোন মিল নেই। তাই ভালকান নামে আসলে কোন গ্রহ নেই এবং বুধই সূর্য থেকে শুরু হওয়া এই সৌরজগতের প্রথম গ্রহ। 'রূপকথার গ্রহ' ভালকান তাই রূপকথা হিসাবেই রয়ে গেল। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এতবড় ভুলের উদাহরণ খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

বুধের আশেপাশে কোন কিছুকে খুঁজে বের করা যেমন কঠিন ব্যাপার তারচেয়ে কঠিন ব্যাপার হল বুধ গ্রহকে পর্যবেক্ষণ করা। একথাটি কিছুদিনের মাঝেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা টের পেলেন। এর প্রধানত দুটো কারণ ছিল, প্রথমতঃ এটি প্রায় সবসময়ই সূর্যের খুব কাছে থাকে যা যে কোন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের জন্য অসুবিধাজনক। দ্বিতীয়তঃ এটি বেশ দূরে অবস্থিত এবং তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট বস্তু। ১৯৬০ সালে ফ্রান্সের জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেমিকেল ও মুলার এর ব্যাস বের করেন ২৯০০ মাইল আর জি. ভকোলিয়ার মেপে দেখেন তা ৩০৩০ মাইল। যদিও আকারে বুধ চাঁদের চেয়ে তেমন একটা বড় নয় কিন্তু এর ভর চাঁদের তুলনায় অনেকগুণ বেশী।

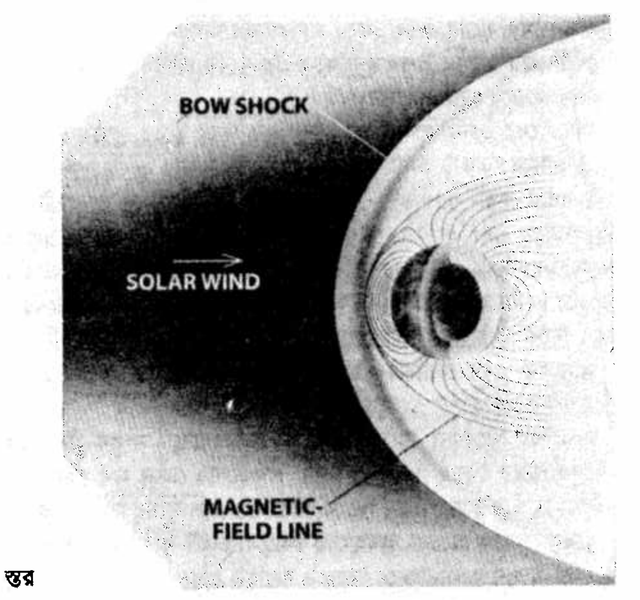

বুধের চৌম্বক স্তর

তাছাড়া আন্তঃ সংযোগের সময় একে সাধারণত দেখা যায় না, কারণ এর অনুজ্জ্বল, অন্ধকারে ঢাকা অর্ধগোলক আমাদের দিকে ফিরে থাকে। এসব বিষয় থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমরা বুধ-এর পৃষ্ঠের বিভিন্ন গঠন, অবয়ব, আকৃতি, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খুবই কম জানি।

বুধ সম্পর্কে টেলিস্কোপ দিয়ে সত্যিকার পর্যবেক্ষণ শুরু করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম হার্সেল, যিনি ইউরেনাস গ্রহের আবিষ্কারক। যদিও পর্যবেক্ষণে তিনি প্রতিভাবান ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন কিন্তু তিনিও তার নিজের আবিষ্কৃত নতুন ধরণের শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়েও বুধের কোন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারেননি। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায় জার্মানির সৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহান শ্রোটার, যার হাতে এই গ্রহের প্রথম তৈরী করা একটি সঠিক ও নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায় এবং সঙ্গত কারণেই বিশ্বাস করা হয় যে তিনি বুধপৃষ্ঠে কতগুলো নির্দিষ্ট ও স্থায়ী চিহ্ন বের করতে পেরেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত শ্রোটার একজন সৎ ও কষ্ট সহিষ্ণু পর্যবেক্ষক হলেও, তিনি মোটেই ভালভাবে আঁকতে পারতেন না, যার ফলে তার বর্ণিত 'আবিষ্কারসমূহ', যেমন এগার মাইল উঁচু একটি পাহাড় ইত্যাদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায়নি। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে যেখানে হার্সেলের মত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হার স্বীকার করেছেন সেখানে তিনি সফল হয়েছেন।

তবে ইটালীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী জি.ভি. শিপারলি, যিনি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির জন্য বিখ্যাত ছিলেন, বুধের পৃষ্ঠভাগের তুলনামূলক আস্থাযোগ্য একটি মানচিত্র তৈরী করেন। সূর্যাস্তের অপেক্ষা না করে দিনের বেলাতেই যখন বুধ খুব নীচু আকাশে বিচরণ করে তখন তিনি তার অধিকাংশ পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করেন এবং ১৮৮১ থেকে ১৮৮৯ সালের মাঝে তিনি কতগুলো কালোদাগ, সুনির্দিষ্ট কিছু আঁকাবাঁকা চিহ্ন এবং কিছু কালচে দাগ তার গোলাপী ক্যানভাসে তৈরী মানচিত্রে অংকন করেন। তিনি বুধের আবর্তনকালজনিত সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করেন। যদিও শ্রোটার এক্ষেত্রে পৃথিবী হিসাবে ২৪ ঘন্টাকে একটি মানদন্ড হিসাবে ধরে নেন কিন্তু শিপারলি

তার গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে এক অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, এর একটি গোলার্ধ সবসময় সূর্যের দিকে ফিরে থাকে আর অন্যদিকে থাকে চিরস্থায়ী অন্ধকার। যার অর্থ হলো বুধ নিজের অক্ষের উপর ঘূর্ণনকাল এর সূর্যের চারিদিকে বাৎসরিক আবর্তনকালের সমান-যা পৃথিবীর হিসাবে প্রায় ৮৮ দিন।

যদি বুধের কোন অক্ষীয় ঘূর্ণন না থাকে তবে বুধের পৃষ্ঠের প্রতিটি অংশ সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আসবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে শিপারলীর বুধের ঘূর্ণন সম্পর্কিত এই আচরণ খুব সহজেই বর্ণনা করা যায়। মনে করুন, একটি কক্ষের মাঝে চেয়ারটি হল সূর্য আর আপনার মাথাটি হল বুধ গ্রহ। এখন চেয়ারের দিকে তাকিয়ে এর চারিদিকে চলতে আরম্ভ করুন। যদি আপনি আপনার মুখটি চেয়ারের দিকে সব সময় ফিরিয়ে রাখতে চান তবে আপনাকে আস্তে আস্তে হাঁটতে হবে তা না হলে অর্ধেক পথ যাওয়ার পর আপনার মাথাটি পিছনের দিকটি আপনা-আপনি চেয়ারের দিকে ঘুরে যাবে। যা হোক ঠিকভাবে হাঁটতে হাঁটতে আপনি যখন প্রারম্ভিক বিন্দুতে ফিরে আসবেন তখন চেয়ারটির চারদিকে আপনার ঘূর্ণনের একটি চক্র শেষ হবে এবং ঠিক এভাবেই *শিপারলী বর্ণিত* বুধ সূর্যের চারদিকে ঘুরে থাকে।

সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে দেখা যায় তার ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক ছিল এবং এর পরিণতি হিসাবে বুধ গ্রহের ক্ষেত্রে 'রাত' ও 'দিন' শব্দগুলোর কোন অর্থ রইল না। এর একপাশে সারা জীবনই সূর্যের তীব্র আলো এসে পড়বে আর অন্যপাশে সূর্যের মৃদু আলোও কোনদিন পৌঁছবে না।

বুধের এরকম অচেনা ব্যবহারের পিছনে একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। যখন বুধ জন্ম লগ্নের সময় সম্পূর্ণ আলাদাভাবে অবস্থান করছিল তখন এটি খুব গরম ও প্লাস্টিক অবস্থায় ছিল এবং এর ঘূর্ণন গতিও ছিল অনেক বেশি। চাঁদের আকর্ষণে যেমন পৃথিবীর সমুদ্রের বুকে বড় বড় ঢেউ তৈরী হয় ঠিক তেমনিভাবে সূর্য আঠাল বুধেও একরকম ঢেউ তৈরী করেছিল, যার ফলে সূর্যের দিকে গ্রহের গঠন উপাদানসমূহ পুঞ্জীভূত হয়ে স্ফীত হয়ে উঠে এবং যেহেতু বুধ-এর নিজের অক্ষের ঘূর্ণন গতি রয়েছে তাই সূর্যের টান এই স্ফীত অংশকে সব সময় স্থির রাখে। এই প্রক্রিয়ার ফলে বুধের ঘূর্ণন গতি ধীরে ধীরে কমে আসে এবং সূর্যের তুলনায় দু'ধরণের গতিও কমে যায়, দিনের সময় বাৎসরিক আবর্তনকালের সমান হয়ে পড়ে আর ঢেউয়ের মত স্ফীত অংশগুলো সূর্যের দিকে ফিরে থাকে।

যদি বুধ সূর্যের চারদিকে একটি নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরতে থাকে তবে গ্রহটির ঠিক অর্ধেক সবসময় সূর্যের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। কিন্তু সত্যিকার অবস্থা আরো জটিল। সন্দেহাতীতভাবে গ্রহটি এর অক্ষের উপর একটি নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরছে কিন্তু কক্ষপথ বরাবর এর গতি সবসময়ই পরিবর্তিত হয়। বুধের কক্ষপথ পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি উপবৃত্তাকার এবং সূর্য থেকে এর দূরত্ব ২৮ .৫ মিলিয়ন মাইল যখন এটি অনুসূর অবস্থানে থাকে আর অপসূর অবস্থানে এই দূরত্ব প্রায় ৪৩ .৫ মিলিয়ন মাইল। সৌরজগতের চলাচলের নিয়ম অনুসারে দূরত্ব যত কম হবে, এর গতি ততই বাড়তে থাকবে। তাই অনুসূরের কাছে বুধ খুব দ্রুত চলতে থাকে যার গতি প্রায় ৩৬ মাইল/সে. যা অপসূরের নিকটে কমে দাঁড়ায় ২৪ মাইল/সে.। কখনও এর গতি গ্রহের অবস্থানের তুলনায় বেশি, কখনও গতি পিছিয়ে পড়ে।

একইভাবে এই গতি বুধের আকাশে সূর্যের চলার পথে প্রভাব বিস্তার করে বলে মনে হয়। চিরস্থায়ী দিনের অঞ্চল ও সীমাহীন রাতের এলাকার মাঝে অবস্থিত একটি অঞ্চলেই কেবল সূর্য উদয় ও অস্ত যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই এলাকার নাম দিয়েছেন 'গোধূলিময় অঞ্চল', যদিও এই এলাকার সীমা খুব একটা নির্দিষ্ট নয় কারণ গ্রহটির অক্ষের আনতি সর্ম্পকে সঠিকভাবে কোন ধারণা আমাদের কাছে নেই।

বুধ কখনোই পৃথিবীর ৫০ মিলিয়ন দূরত্বের চেয়ে কাছে আসে না যা থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, পৃথিবী থেকে ছোট টেলিস্কোপ দিয়ে এর ভূভাগের কিছুই দেখা যাবে না।

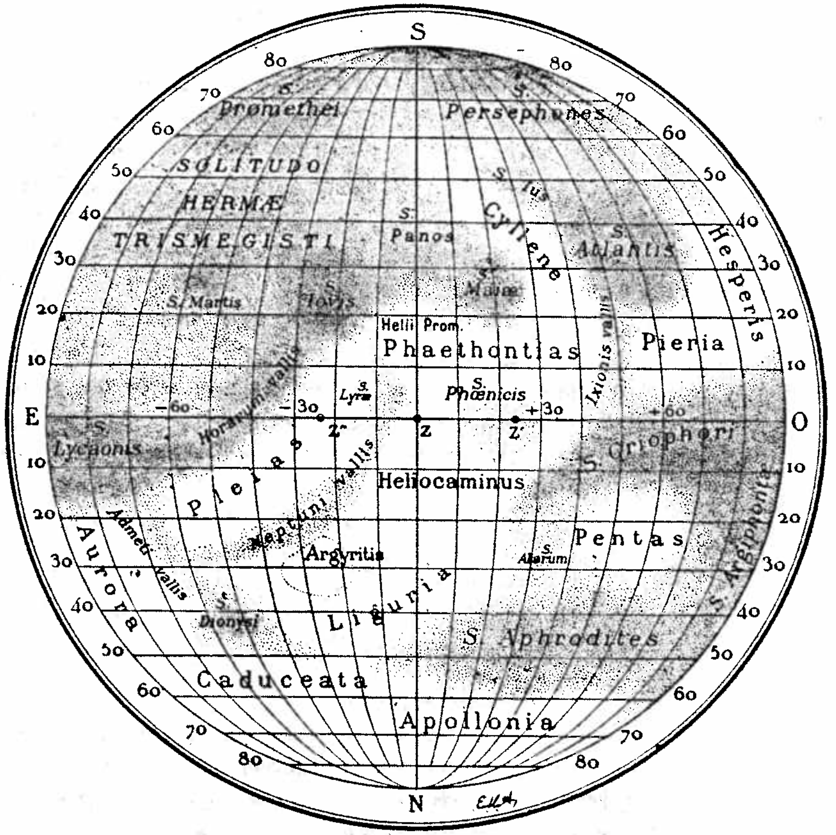

অন্টোনিয়াডির তৈরী বুধের মানচিত্র

গ্রীসের একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ই.এম এন্টোনিয়াডি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে বুধের পৃষ্ঠের এক নিখুঁত মানচিত্র তৈরী করেন যা এখন বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রীসের এই বিজ্ঞানী প্রায় সারাটা জীবনই ফ্রান্সে কাটিয়েছেন এবং মউডেন অবজারভেটরীর ৩৩ ইঞ্চি প্রতিসরণ টেলিস্কোপের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করতেন। শিপারলীর মত তিনিও তার সব পর্যবেক্ষণ সূর্য দিগন্তে এবং বুধ উর্ধ্বাকাশে থাকা অবস্থায় করতেন তবে তার একটি বাড়তি সুবিধা ছিল টেলিস্কোপ ব্যবহারের দিক থেকে, কারণ তার ব্যবহৃত মউডেন অবজারভেটরীর প্রতিসরণ টেলিস্কোপটি ছিল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও চমৎকার টেলিস্কোপ।

এন্টোনিয়াডির তৈরী চার্টটির সাথে শিপারলীর তৈরী মানচিত্রের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যাতে তিনি হালকা ও গাঢ় অঞ্চলগুলোর নামও দিয়েছিলেন। বুধ পৃষ্ঠের খাদসমূহের নামকরণ করা হয়েছে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নামানুসারে; যেমন- বাখ, মোৎসার্ট, ভ্যান গগ, শেখভ ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি মারা যাওয়ায় ফ্রান্সের এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বি. লয়েট তার অসমাপ্ত কাজ চালিয়ে যান। কিন্তু তিনিও ১৯৫২ সালে মারা যান যার ফলে বিজ্ঞানের এক বিরাট স্থান শূন্য হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ডলফাস পীরেনীজ পর্বতে (স্পেন) পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের ঘন ও ঝঞ্জাপূর্ণ বায়ুস্তরের উপরে 'পিক ডে মিডি' অবজারভেটরীর ২৪ ইঞ্চি

প্রতিসরকের সাহায্যে বুধ সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন। তার এই কাজের জন্য তাকে আধুনিক বুধের গবেষণার প্রদর্শক বলে গণ্য করা হয়।

বর্তমানে এন্টোনিয়াডি ও ডলফাসের তৈরী মানচিত্রকে সঠিক বলে ধরে নেয়া হয়েছে যদিও এসব মানচিত্রে অনেক কিছুই সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়। তাদের কাছে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বুধ সম্পর্কে অনেক কিছু বেরিয়ে এসেছে। আমরা কখনোই বুধের 'পূর্ণ চিত্র' দেখতে পারব না কারণ এটি সবসময়ই সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের দিকে বহিঃসংযোগ (Superior conjunction) অবস্থায় থাকে। যখন এটি উজ্জ্বলভাবে আকাশে উদিত হয়, তখন বুধের চমৎকার কলা চোখে পড়ে। মাঝারী আকারের টেলিস্কোপ দিয়েই বুধের এই কলা পরিষ্কারভাবে দেখা যায় এবং এর ক্রমাগত পরিবর্তনকারী 'প্রান্তসীমা'ও খুবই অদ্ভুত।

প্রান্তসীমা (terminator) হল সূর্যময় অঞ্চল ও অন্ধকার গোলকের মাঝামাঝি সীমানা আর লিম্ব (Limb) হল দৃশ্যমান চাকতির প্রান্তভাগ। চিত্রে-এ এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে যেখানে 'প্রান্তসীমা' ডটলাইন ও লিম্ব টানা রেখা দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। চাঁদের ক্ষেত্রে এই 'প্রান্তসীমা' সবসময়ই বন্ধুর ও ভাঙ্গা দেখা যায় যেখানে পাহাড়ের চূড়া সূর্যালোকিত থাকে আর পাশের উপত্যকাসমূহ তখনো অন্ধকারে ঢাকা থাকে। কিন্তু বুধের

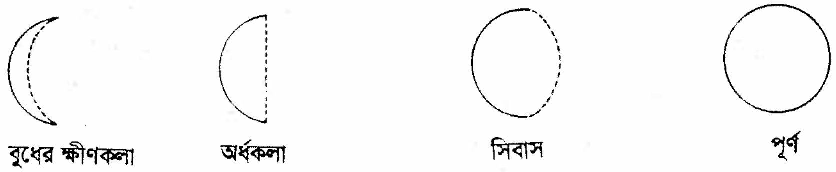

প্রান্তসীমা ও লিম্ব

'প্রান্তসীমা' প্রকৃতপক্ষে অনেক মসৃণ বলে মনে হয়, তবে মাঝে মাঝে অভিক্ষেপ ও অনিয়মের কিছু তথ্য পাওয়া যায় যা গ্রহের পৃষ্ঠ পর্বতময় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী-এই তত্ত্বকেই সমর্থন করে। কলার ক্ষীণপ্রান্তকে এর 'শিখর' (Cusps) বলা হয়। বহু আগে প্রায় ১৮০০ সালে স্রোটার লক্ষ্য করেন যে, বুধের দক্ষিণ প্রান্তরের 'শিখর' সাধারণত উত্তরপ্রান্তের চেয়ে কিছুটা ভোতা। এর কারণ হল চাকতির দক্ষিণাংশ এর উত্তরাংশের চেয়ে অনেক বেশি অন্ধকারময়।

বুধের পৃষ্ঠের চিহ্নগুলো স্থায়ী এবং এই চিহ্নিত স্থানগুলোই এই গ্রহের ভূভাগ। এই চিহ্নগুলো যেহেতু খুব একটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় না- তাই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুব কঠিন কিন্তু ধূসর অঞ্চলগুলো চাঁদের 'পানি বিহীন' সাগরগুলোর মতই মনে হয়। তবে এই গর্তগুলো কি চাঁদের খাদের মত গুরুত্বপূর্ণ কিনা তা বের করে দেখাই ছিল পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য।

বুধে মেরিনার - ১০

বহুকাল ধরে এত প্রাণান্তকর চেষ্টার পরও যখন বুধ সম্পর্কে তেমন একটা কিছু জানা সম্ভব হল না তখন আন্তঃগ্রহ পর্যবেক্ষণের বিশাল পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সত্তরের দশকে 'মেরিনার-১০' নামে একটি সন্ধানী মহাশূন্যযান নাসা উৎক্ষেপন করে। এটিই ছিল বুধে পাঠানো এখন পর্যন্ত প্রথম ও শেষ অভিযান। তবে সূর্যের বিরাট মহাকর্ষ শক্তিকে উপেক্ষা করে বুধে পৌছানো মোটেই সহজ কাজ ছিল না। এই শক্তিকে উপেক্ষা করে বুধে পৌছানোর জন্য একে শুক্রের চারদিকে ঘুরে যেতে হয়েছিল। মেরিনার ১০ থেকে সূর্যের চারদিকে আবর্তনরত বুধের কক্ষপথে তিনটি সন্ধানীযান (fly by) পাঠানো হয়েছিল ঃ মার্চ ২৯/১৯৭৪, সেপ্টেম্বর ২১/১৯৭৪ এবং মার্চ ১৬/১৯৭৫।

তিনটি যান থেকে মাত্র ৪০% অঞ্চলের ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। পাঠানো এসব ছবি থেকে বুধের পৃষ্ঠভাগ সম্পর্কে আমাদের ধারণা প্রায় ৫০০০ গুণ বেশী বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও বুধের এই ছবিগুলো কিছুটা ভুল ধারণা দিয়েছিল। ছবি দেখে মনে হয়েছিল বুধ যেন সূর্যের কাছে বসানো চাঁদের অনুরূপ মাত্র। ফলে আমেরিকার মহাকাশ অভিযানে পরবর্তীকালে বুধ খুব একটা গুরুত্ব পায়নি, এখন পর্যন্ত চাঁদে যান পাঠানো হয়েছে ৪০টিরও বেশি, শুক্রে ১৬টি আর মঙ্গলে গিয়েছে ১৫টির বেশি মহাকাশযান। এমনকি এই শতাব্দীর শেষদিকে মহাকাশযানের এক বিরাট বহর শুক্র, মঙ্গল, বৃহঃস্পতি ও শনির কক্ষপথে গিয়ে পৌছুবে এবং এরা এসব গ্রহের পরিবেশ ও আবহাওয়া সম্পর্কে বেশ কয়েক বৎসর তথ্যের বন্যা বইয়ে দেবে। কিন্তু সেই তুলনায় বুধ রয়ে যাবে এক অনাবিষ্কৃত গ্রহ হিসাবে, তবে নাসা বুধে প্রেরণের জন্য একটি মহাকাশযান পাঠানোর পরিকল্পনা শুরু করেছে যার বর্ণনা পরে আলোচনা করা হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

পৃথিবী থেকে চালানো সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে বুধ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য বেরিয়ে এসেছে। তবে এই গবেষণা শুরু হয়েছিল মেরিনার-১০ প্রেরিত ছবি ও তথ্য থেকে। মেরিনার অভিযানই বুধের বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে প্রায় শূন্য অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে। বিশেষভাবে তৈরী যন্ত্রপাতির সাহায্যে সন্ধানীযান থেকে পাঠানো ২০০০ ছবি বিশ্লেষণ করা হয়। এসব ছবির কার্যকর বিভাজন ক্ষমতা ছিল প্রায় ১.৫ কি.মি. যা পৃথিবী থেকে বড় টেলিস্কোপে তোলা চাঁদের ছবির সাথে তুলনীয়। বুধের এসব ছবি ছিল একপাশের, অন্যপাশের কোন চিত্র এখনও মানুষ তুলতে সক্ষম হয়নি।

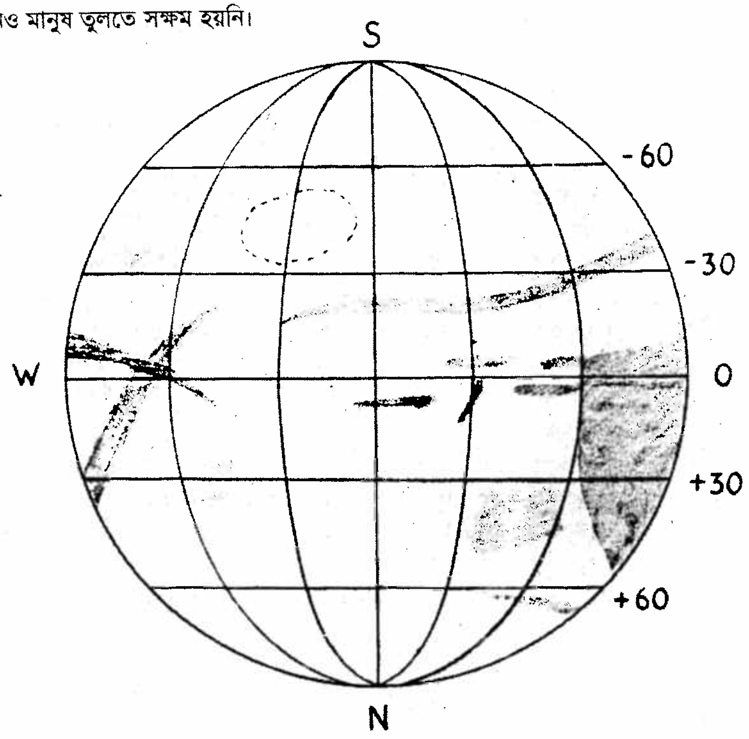

সেন্ড'নারি-তৈরী বুধের মানচিত্র

বুধে পাঠানো মেরিনার-১০-এর ত্বরণের হিসাব থেকে বুধের অবাক করে দেয়া শক্তিশালী মহাকর্ষীয় শক্তির খবর প্রথম উৎঘাটিত হয়। এত ছোট আকারের কোন গ্রহও যে উচ্চ ঘনত্বের হতে পারে, সে সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মত জানতে পারলেন। পৃথিবীর আশেপাশের গ্রহগুলোর (শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল) সবকয়টিই তাদের ঘনত্ব ও আকারের মাঝে রৈখিক সম্পর্ক মেনে চলে। এদের মাঝে সবচেয়ে বড় পৃথিবী যার ঘনত্বও বেশি, আর সবচেয়ে ছোট চাঁদ ও মঙ্গলের ঘনত্বও অনেক কম। যদিও আকারে বুধ চাঁদের প্রায় (চাঁদের চেয়ে মাত্র ৪০ % বড়) কাছাকছি কিন্তু ঘনত্বের দিক থেকে এটি প্রায় পৃথিবীর ঘনত্বের সমান।

এই পর্যবেক্ষণ থেকে বুধের ভিতরের গঠন সম্পর্কে একটি মৌলিক তথ্য বেড়িয়ে এসেছে। গ্রহের বহিরাবরণ তুলনামূলকভাবে হালকা পদার্থ দ্বারা তৈরী হয়েছে যেমন ঃ সিলিকেট পাথর । কিন্তু পৃষ্ঠ থেকে ভিতরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে এর ঘনত্বও বাড়তে থাকে কারণ উপরের পাথুরে স্তরের ক্রমাগত চাপ এবং ভিতরের অংশে অন্য ধরণের গঠনের জন্য। গ্রহের উচ্চ ঘনত্বের এর কেন্দ্রটি সম্ভবত লোহার তৈরী।

সঙ্গত কারণেই বুধে তার আকারের চেয়ে অনেক বড় কেন্দ্র রয়েছে বলে মনে করা হয়। এই তথ্য নতুন করে সৌরজগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সম্পর্কে পুরনো ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়ের বির্তককে জীবন্ত করে তোলে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, সব গ্রহ-ই প্রায় একই সময়ে সৌরনীহারীকা থেকে ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে বুধের এই অস্বাভাবিক ঘনত্ব সম্পর্কে তিনটি ব্যাখ্যা দেয়া যায়। প্রথমতঃ বুধের গঠনকারী আশেপাশের সৌরনহিরীকার গঠন কোন নাটকীয় কারণে অন্য রকমের ছিল, যা সৌরজগত উৎপত্তির বিভিন্ন মডেলে বর্ণিত অবস্থার চেয়ে ভিন্নতর, দ্বিতীয়তঃ সৌরজগতের আদি অবস্থায় সূর্য সম্ভবত আরও শক্তিশালী ছিল, যার প্রভাবে বুধে উপস্থিত নিম্ন ঘনত্বের উপাদানসমূহ বাষ্পীভূত হয়ে চলে গিয়েছে। তৃতীয়তঃ বুধ গ্রহ উৎপন্ন হওয়া মাত্র বিরাট কোন বস্তুর সাথে সংঘর্ষের ফলে কম ঘনত্ব বিশিষ্ট পদার্থসমূহ বাষ্পীভূত হয়েছে। কিন্তু যথেষ্ট তথ্য প্রমাণের অভাবে এদের কোনটিই গ্রহণ করা আপাতত সম্ভব নয়।

শুধু এখানেই যে বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ হয়েছেন তা নয়, তারা পৃথিবীর গবেষণাগারের প্রাপ্ত তথ্যের সাথে মেরিনারের উপাত্ত মিলিয়ে এখন পর্যন্ত বুধের পাথরে কতটুকু লোহা রয়েছে তা নির্ণয় করতে পারেননি। এর পৃষ্ঠে লোহার অভাব থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, বুধের কেন্দ্রে লোহার প্রাচুর্য রয়েছে। পৃথিবী পৃষ্টে লোহা আছে আর চাঁদ ও মঙ্গলের লোহা স্পেকট্রোস্কোপের সাহয্য সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাই আন্তঃগ্রহগুলোর মাঝে একমাত্র বুধেরই উচ্চ ঘনত্বের লোহ সমৃদ্ধ কেন্দ্র এবং নিম্ন ঘনত্বের সিলিকেট -এর পৃষ্ঠ রয়েছে। বুধে এত দীর্ঘ সময় ধরে ধাতু তরল ছিল যে ভারী মৌলগুলো এর কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত হয়েছে ঠিক যেমন ধাতু নিস্কাশনের সময় লোহা ধাতুমলের (Slag) নিচে পুঞ্জীভূত হয়।

মেরিনার -১০ থেকে বুধ সম্পর্কে আর একটি চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেছে-বুধের অত্যন্ত শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে যা পৃথিবী ছাড়া অন্য যে কোন আন্তঃগ্রহগুলোর চেয়ে বেশি শক্তিশালী। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র থাকার কারণ হল এর কেন্দ্রে বিদ্যুৎবাহী গলিত ধাতুসমূহর ক্রমাগত বৃত্তাকার পথে ঘুরছে এবং বিজ্ঞানীরা এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন 'Self sustaining dynamo'। যদি বুধের চৌম্বক ক্ষেত্রের উৎস একই হয়ে থাকে তবে অবশ্যই গ্রহটির অভ্যন্তরভাগ পৃথিবীর মতই তরল।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পিছনে একটি বাধা রয়েছে। বুধের মত ছোট গ্রহের ক্ষেত্রে এর আয়তনের অনুপাতে পৃষ্ঠ অনেক বেশি। যেমন - বুধের আয়তন $V_m = (4/3)\pi r^3 Km^3$

(বুধের ব্যাসার্ধ = r = 2436Km)

বুধের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল $S_m = 4\pi r^2 Km^2$

বুধের পৃষ্ঠ ও আয়তনের অনুপাত = $4\pi r^2 \times (3/4\pi r^3) = 3/r = 3/2436\text{-}3 = 1.23 \times 10km$

অন্যদিকে পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই অনুপাত $= 3/R = 3/6356 = 4.72 \times 10^{-4}$ km

[পৃথিবীর ব্যসার্ধ = R = 6356 Km]

সুতরাং পৃথিবীর তুলনায় বুধের এই অনুপাত প্রায় ২.৬ গুণ বেশি। যদি অন্য সব বিষয় স্থির থাকে, তবে ছোট বস্তু মহাকাশে দ্রুত শক্তি বিকিরণ করবে। যদি বুধে উচ্চ ঘনত্ব ও শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র বিশিষ্ট শুধু লোহার কেন্দ্র থেকে থাকে, তবে এই কেন্দ্র বহু যুগ আগেই ঠান্ডা ও ঘনীভূত হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কঠিন কেন্দ্র কখনও "Self Sustaining dynamo" প্রক্রিয়ায় চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরী করতে পারে না।

এই বৈপরীত্য থেকে খুব সহজে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে- বুধের কেন্দ্রে লোহা ছাড়াও অন্য মৌল বা যৌগ রয়েছে। এই সব পদার্থ লোহার হিমাংককে নিচে নামিয়ে দেয় যার ফলে বুধের কেন্দ্র (Core) অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপমাত্রায়ও তরল থাকে। লোহার পর দ্বিতীয় পদার্থ হিসাবে প্রধান দাবীদার হল 'সালফার' যা মহাকাশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।সাম্প্রতিক এক মডেলে অনুমান করা হয়েছে যে, বুধের কেন্দ্র লোহা দিয়ে তৈরী হলেও এর চারদিকে লোহা ও সালফারের একটি তরল খোল (Shell) রয়েছে যার তাপমাত্রা ১৩০০°K। এই সমাধান আপাতত সত্যি বলে মনে হলেও এ ব্যাপারে এখনও বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হতে পারেননি।

যখন কোন গ্রহের পৃষ্ঠ যথেষ্ট পরিমাণে ঘনীভূত হয়ে যায়, তখন এতে ধীরে ধীরে অনেক সময় ধরে চাপ প্রয়োগ করলে তা হয় বেঁকে যাবে, নয়ত হঠাৎ আঘাতের ফলে ভাঙ্গা গ্লাসের মত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। চার বিলিয়ন বৎসর আগে উৎপন্ন হওয়া বুধের পৃষ্ঠ প্রতিনিয়ত উল্কার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এবং ভিতর থেকে অনেক লাভার তীব্র স্রোতও বেরিয়ে এসেছে। এই ঘটনার ফলে এটি শক্তি বিকিরণ করে ভূভাগকে বিগলিত করবে অথবা গভীর ও তরল স্তরকে আঘাত করবে। বুধের পৃষ্ঠ এর কেন্দ্র ঘনীভূত হওয়ার পরই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে।

গ্রহ ভূবিজ্ঞানীরা এসমস্ত বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে বুধের মডেল তৈরীর চেষ্টা করছেন। যদিও এর পৃষ্ঠ গঠনকারী বিভিন্ন পাথর সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সঠিক কোন ধারণা নেই। বুধের বয়স নির্ণয় করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এর মাটিকে রেডিও এক্স-রে পরীক্ষা করা -যা এ মুহূর্তে অসম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানীরা 'উপরিপাত নীতি'-এর উপর ভিত্তি করে অন্যভাবে বুধের বয়স নির্ণয় করার চেষ্টা করছেন। নীতিটি হলঃ কোন উপাদন যদি অন্য কোন উপাদানের উপরে থাকে বা আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করে, তবে সেই উপাদানের বয়স অপেক্ষাকৃত কম হবে। এই নীতি দ্বারা বিভিন্ন খাদের বয়স তুলনামূলকভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে।

বুধ পৃষ্ঠের ফাটলের ইতিহাস

বুধে বেশ কয়েকটি বড় খাদ রয়েছে যা বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় পাহাড় ও উপত্যকার বলয়-এর সমন্বয়ে গঠিত। এসমস্ত বলয় কোন উল্কার আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে যা ঢেউয়ের মত অগ্রসর হয় এবং পরে ঘনীভূত হয়ে যায়। বুধের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে "Caloris basin' নামের "bull's eye" যার ব্যাস ১৪০০ কি. মি. এবং দেখতে অনেকটা চাঁদের ঝর্ণা সাগরের মত (Mare Imbrium)। সংঘর্ষের ফলে যে খাদের সৃষ্টি হয়েছে তা অনেকখানি সমতল। যে হারে কোন বস্তু গ্রহের পৃষ্ঠে অভিক্ষিপ্ত হয়, তা থেকে হিসাব করে এবং এ সমস্ত খাদের আকার বন্টন থেকে বোঝা যায় "Caloris basin' টি সম্ভবত ৩.৬ বিলিয়ন বৎসর আগে সৃষ্টি হয়েছে, যাকে সময়ের একটি ভিত্তি হিসাবে ধরে নেয়া হয়। এই সংঘর্ষ এত ভয়ংকর ছিল যে বুধের অপর পৃষ্ঠেও এর প্রভাব দেখা যায়। 'Caloris' এর উল্টো পিঠেও তাই অসংখ্য ফাটল ও ভাঙ্গা স্থান পাওয়া গেছে।

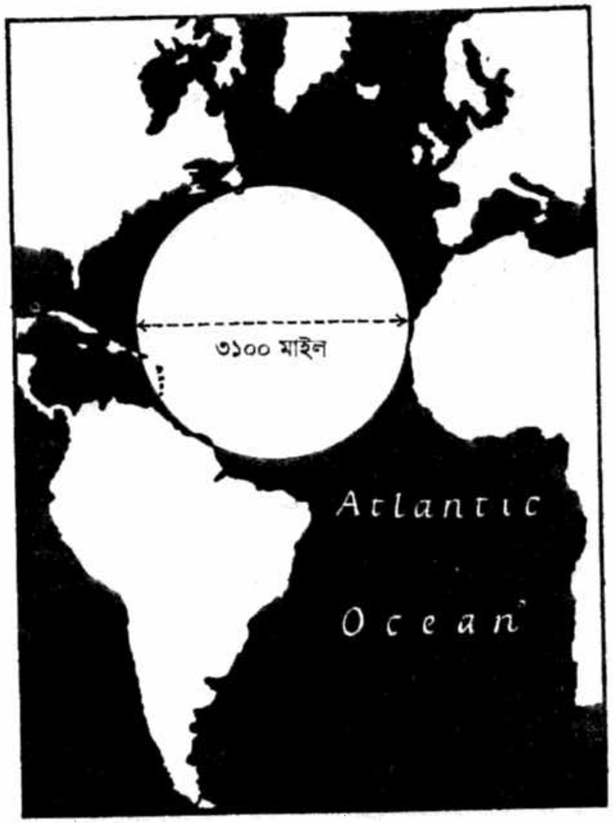

আটলান্টিক মহাসাগরের তুলনায় বুধের আকার

বুধের পৃষ্ঠে আড়াআড়িভাবে ছেদ করা কতগুলো সরল রেখার মতো দাগ দেখা যায়, যাদের উৎপত্তি সম্পর্কে তেমন একটা কিছু জানা যায় না। রেখাগুলো উত্তর-দক্ষিণ, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণপূর্বে ছড়িয়ে রয়েছে। এধরনের রেখাগুলোকে 'বুধের তারজালি' বলা হয়, এই রেখাগুলোর উৎপত্তির কারণ হিসাবে বলা হয় যে বুধপৃষ্ঠে ঘনীভূত হচ্ছিল এমন একটি অবস্থায়, যখন গ্রহের গতি ছিল অনেক বেশী (দিনের দৈর্ঘ্য ছিল ২০ ঘন্টা))। এই দ্রুত ঘুর্ণনের কারণে গ্রহের নিরক্ষীয় অঞ্চলে খানিকটা স্ফীত হয়ে উঠে। পরে যখন এর গতি কমে আসে তখন মহাকর্ষ বলের দ্বারা এটি আরও গোলাকার হয়ে ওঠে এবং বুধপৃষ্ঠে যখন এধরনের পরিবর্তনকে প্রশমিত করতে ব্যস্ত ছিল ঠিক তখনই এ সব দাগের সৃষ্টি হয় এই ক্ষুদ্র ভাঁজগুলো 'Caloris' কে ছেদ করেনি এর অর্থ এসব দাগ ক্যালোরিস সংঘর্ষের অনেক আগেই গঠিত হয়েছিল।

যখন বুধের গতি কমে যাচ্ছিল তখন গ্রহটিও ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে আসছিল, আর এতে কেন্দ্রের বহির্ভাগও ঘনীভূত হচ্ছিল। এই ধরণের সংকোচনের ফলে গ্রহের পৃষ্ঠের প্রায় এক মিলিয়ন বর্গ কি. মি. এলাকা কমে গিয়েছিল, যার স্বাভাবিক পরিণতিতে এর পৃষ্ঠে অসংখ্য ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে, যার প্রমাণ কতগুলো ক্রমাগত বাঁকা ফাটল, উঁচু পাহাড় ও বুধের আড়াআড়ি দাগগুলো।

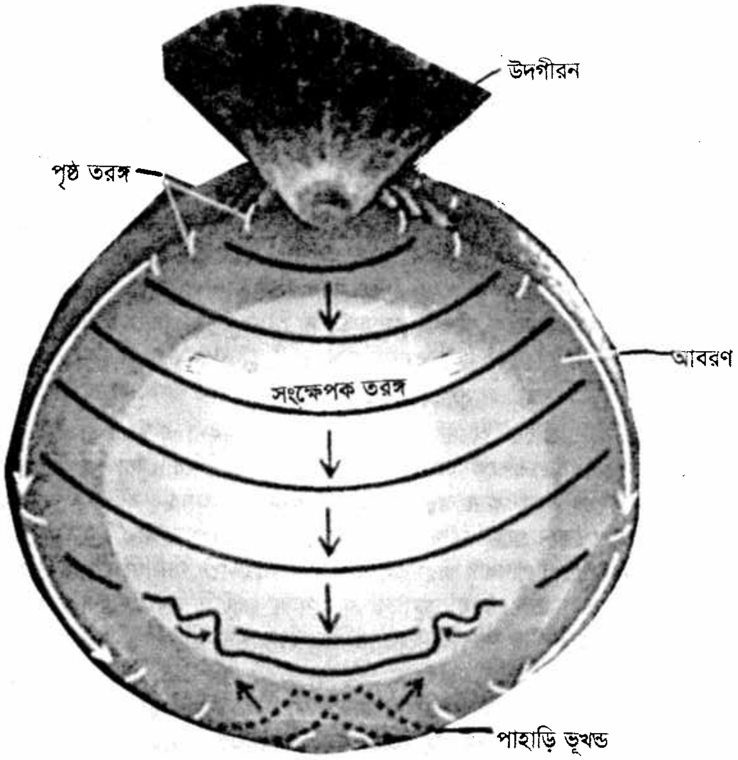

কেলোরিস খাদ ঃ (উপরে) খাদটি তৈরী হয় প্রায় ৩.৬ বিলিয়ন বৎসর পূর্বে যখন কোন বিরাট বস্তু বুধে আঘাত করে বিরাট এক সংকোচন তরঙ্গ মাঝ দিয়ে চলে যাওয়ার আঘাতের ঠিক বিপরীত স্থানে রেখাংকিত ও পর্বতময় উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছে। (নীচে) ঃ কেলোরিসের প্রান্ত কতগুলো সমকেন্দ্রিক তরঙ্গের মত যা সংঘর্ষের ঠিক পরেই ঐ স্থানেই ঘনীভূত হয়েছে। খাদের তলদেশের সমতল অংশের ব্যাস প্রায় ১৪০০ কি. মি. এই তলদেশে আবার অনেক ছোট ছোট খাদ দেখা যায়।

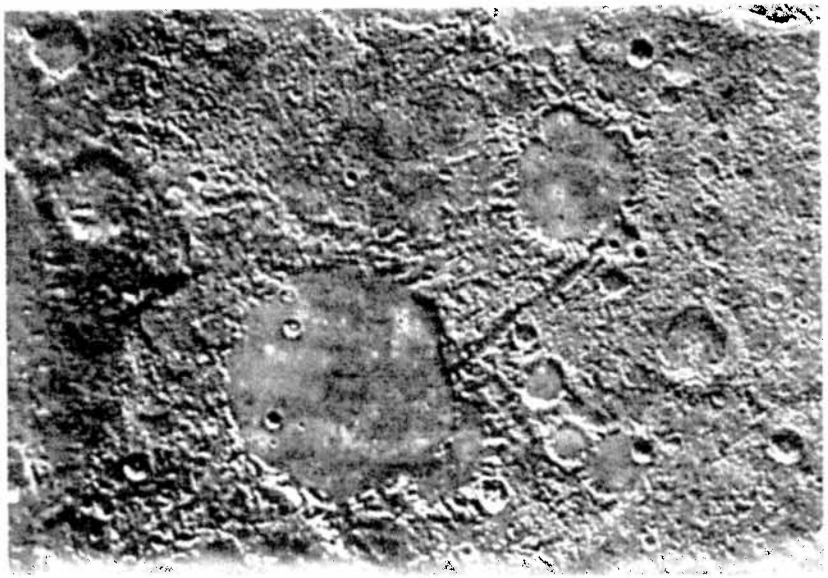

পৃথিবীর তুলনায় বুধ, মঙ্গল ও চাঁদে অনেক বেশী খাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তিনটি গ্রহেই খাদগুলোর আকারের মাঝে যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও বুধের ক্ষেত্রে খাদের আকার অপেক্ষাকৃত বড়। বুধে আঘাত করা বস্তুসমূহের গতি সম্ভবত অন্যান্য গ্রহের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। এরকম আচরণের কারণ হল আঘাত করা বস্তুগুলো উপবৃত্তাকার পথে সূর্যের চারদিক থেকে ঘুরে এসে বুধের কক্ষপথে অনেক গতি নিয়ে বুধের পৃষ্ঠকে আঘাত করে। সাধারণভাবে প্রশ্ন আসে এরকম অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের বস্তুগুলো কোথা হতে আসল? বিজ্ঞানীদের ধারণা, এদের উৎপত্তি সম্ভবত গ্রহাণু বেল্টে (Asteroid Bet)। অন্যদিকে বৃহস্পতির উপগ্রহগুলোতে আবার অন্য ধরণের খাদের দেখা পাওয়া যায়, যেগুলো অন্য জায়গায় উৎপন্ন হওয়া বস্তুর আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে।

বুধের হালকা বায়ুমন্ডল

অনেক বৎসর পর্যন্ত বুধে আদৌ কোন বায়ুমন্ডল আছে কিনা এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক চলে আসছিল। অন্ততপক্ষে একথা খুব নিশ্চিতভাবেই ধরে নেয়া যায়, বুধের ক্ষীণ আকর্ষণের পক্ষে উপরে ভারী কোন বায়ুমন্ডলের সৃষ্টি করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আসলে পুরো বিষয়টিই নির্ভর করে কোন গ্রহের মুক্তিবেগের উপর যা বুধের ক্ষেত্রে মাত্র ২¹/৪ মাইল/সে, যা পৃথিবীর জন্য ৭ মাইল/সে। পৃথিবীর বায়ুমন্ডল গঠনকারী অধিকাংশ গ্যাসগুলো মুক্তিবেগের চেয়ে দ্রুত চলাফেরা করতে পারেনা, যার ফলে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে কখনই এরা মহাশূন্যে চলে যেতে পারেনা। চাঁদের বেলায় ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অন্যরকম যার মুক্তিবেগ মাত্র ১¹/২ মাইল/সে হয়তোবা সৃষ্টির আদিতে চাঁদের বায়ুমন্ডল গঠনের যথেষ্ট পরিমাণে গ্যাস থাকলেও চাঁদের মাধ্যাকষর্ণ এসব গ্যাস ধরে রাখতে পারেনি যার ফলে চাঁদ আজ বায়ুহীন। বুধের ক্ষেত্রে এই অবস্থা প্রায় সমান সমান। বুধ মোটামুটিভাবে ভারী গ্যাসগুলো ধরে রাখতে সক্ষম যাদের কণাগুলো বেশী ধীরে ধীরে চলাফেরা করে। কিন্তু তারপরও পৃথিবীর মত বায়ুমন্ডল বুধে আশা করা বাতুলতা মাত্র।

বুধের বায়ুমন্ডল পর্যবেক্ষণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পরিবেশ হল সূর্যের সামনে দিয়ে বুধ অতিক্রমের সময়টি। এসময়ে গ্রহটিকে খুব ছোট দেখা গেলেও এর পিঠের কালো দাগগুলো খুব স্পষ্টভাবে নজরে পড়ে এবং কোনরকম অস্পষ্ট দাগও এর কিনারার দিকে দেখা যায় না। যদি বুধে কোন ঘন বায়ুমন্ডল থাকত তবে শুক্রের মত এরও ঝাপসা স্তর চোখে পড়ত। বুধের কক্ষপথ আমাদের দিকে ৭° কোণে বেঁকে আছে আর এর 'ট্রানজিট' ঘটাও খুবই বিরল ঘটনা। বুধের পূর্ববর্তী ট্রানজিটগুলো ঘটেছিল ঃ নভেম্বর ৭/১৯৬০; মে ৯/১৯৭০; নভেম্বর ১০/১৯৮৬ এবং মে ৬/১৯৯৩ (বুধের ট্রানজিট কেবলমাত্র মে বা নভেম্বর মাসেই ঘটে)। এই ধরণের ট্রানজিটের সময় কিছু কিছু পর্যবেক্ষক একটি অচেনা অজানা ঘটনার বর্ণনা দিলেও বিজ্ঞানীরা প্রথম প্রথম একে চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ট্রানজিটের সময় বুধকে খালিচোখে ভালভাবে দৃষ্টিগোচর না হলেও ছোট টেলিস্কোপে একে পরিষ্কার দেখা যায়।

তারপরেও শিপারলী ও অ্যান্টোনিয়াডি দাবী করলেন যে বুধের কালো অঞ্চলগুলো প্রায়ই সাদা পর্দার মত মেঘ দ্বারা ঢেকে যাচ্ছিল। আর অ্যান্টেনিয়াডি আরও একধাপ এগিয়ে যেয়ে বললেন, তিনি মঙ্গলের চেয়ে ঘন ও স্পষ্ট বায়ুমন্ডল বুধে দেখতে পেয়েছেন। তবে এই বায়ুমন্ডল অবশ্যই পৃথিবীর মত নয়, বুধের আকাশে পানির ফোঁটার স্থায়িত্বকাল বাত্যাচুল্লীর পানির কণা স্থায়িত্বের চেয়েও কম হবে। এখনও পর্যন্ত বুধের বায়ুমন্ডলের উপস্থিতির পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি, তবে পিক-ডে-মিডি অবজারভেটরীর ডলফাস ১৯৫৩ সালে ঘোষণা দিলেন যে, তিনি কখনই মেঘপূর্ণ বায়ুমন্ডল বুধের পৃষ্ঠের উপর দেখতে পাননি, তাই পুরো ব্যাপারটিই আবার এক বিরাট প্রশ্নের মুখে পতিত হয়।

অবশ্য ডলফাস তার বর্ণনায় বুধে খুবই ক্ষীণ বায়ুমন্ডলের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছেন। পৃথিবীর সমুদ্রের উচ্চতার বায়ুমন্ডলের ঘনত্বের তুলনায় বুধের বায়ুমন্ডলের ঘনত্ব মাত্র ৩/১০০০ ভাগ যা পরীক্ষাগারে ব্যারোমিটারে মাত্র এক মিলিমিটার চাপের সমান। এই চাপকে বিজ্ঞানের ভাষায় শূন্যস্থান (Vacuum) বলা হয়। তবে এই পাতলা বায়ুস্তরের গঠন সম্পর্কে তিনি কেবলমাত্র কার্বন ডাই অক্সাইডের উপস্থিতির সম্ভাবনার কথাই বললেন। তবে ডলফাসের পদ্ধতিটি ছিল পরোক্ষ আর পর্যবেক্ষণও ছিল দুর্বল।

১৯৬১ সালে রাশিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোজিরেভ পূর্ণসূর্যগ্রহণের সুবিধা নিয়ে ক্রিমিয়াতে (Crimea) ডলফাসের বক্তব্য নিরীক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফেব্রুয়ারী ১৫ তারিখে তিনি ক্রিমিয়ান অবজারভেটরীতে যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে রইলেন। সাধারণভাবে বুধকে নীচু ও অন্ধকার আকাশের বিপরীতে দেখা গেলেও পর্যবেক্ষণের জন্যে এ অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নয়। পূর্ণসূর্যগ্রহণের সময় এসব সমস্যা দূরীভূত হয় এবং বুধকে মাঝ আকাশেও অন্ধকার পরিবেশে পরিষ্কার দেখা যায়। কোজিরেভ প্রায় ২ ১/২ মিনিট বিশেষভাবে তৈরী যন্ত্রপাতির সাহায্যে বুধের বায়ুমন্ডলের চিহ্ন খুঁজে বেড়ালেন। কিন্তু ফলাফল হতাশাজনক। অবশ্য এই অল্প সময় এ ধরণের কাজের জন্য খুবই অপ্রতুল।

যদি পাতলা কোন বায়ুস্তরের আবরণে ধূলিকণা থাকে এবং অ্যান্টোনিয়াডির মেঘ যদি সত্যি সত্যি থাকে? তবে তা অবশ্যই ধূলিকণা দ্বারা গঠিত হয়েছে। তবে তারা কিভাবে বায়ুমন্ডলের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন তা বের করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বায়ুস্তর এত পাতলা যে, এটি বায়ুমন্ডলে কোন ধরনের ভয়ঙ্কর ধূলিঝড় তৈরী করতে অক্ষম, এমনকি কোন ধরনের আগ্নেয়গিরির উৎগীরণও বুধের মত নির্জীব গ্রহে আশা করা যায় না। সামগ্রিকভাবে বুধে কোন ধরণের মেঘের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়।

বুধ এত ছোট ও দূরে অবস্থিত যে এর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্ণয় করা বেশ কঠিন ব্যাপার। ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরীর পেটিট ও নিকোলসন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুধের তাপমাত্রা সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরেন। দিনের বেলা এর তাপমাত্রা ৭০০°K পর্যন্ত উঠলেও বায়ুমন্ডলের তাপ ধরে রাখার কোন ক্ষমতা না থাকায় রাতে এর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা পরম শূন্যের কাছাকাছিতে নেমে আসে। সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ প্লুটো নিজের অক্ষের উপর আবর্তনের সময়ের চেয়ে কম সময়ে সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসে, যার ফলে এর পৃষ্ঠের প্রতিটি অংশই সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়। তাই এই গ্রহের গড় তাপমাত্রা বুধের সুর্যালোকবিহীন অপর পৃষ্ঠের চেয়ে বেশি। সুতরাং বুধ সৌরজগতের শুধু উষ্ণতম গ্রহই নয়, এটি এই জগতের সবচেয়ে শীতলতম গ্রহও বটে।

তবে মেরিনার-১০ ও তার পরবর্তী গবেষণা থেকে বুধের বায়ুমন্ডল সম্পর্কে একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়েছে। বুধের শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র, সৌর বায়ুর সাথে উড়ে আসা আধানযুক্ত কণাগুলোকে ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট। সৌরবায়ু হল সূর্য থেকে উত্থিত প্রোটনের মেঘ। চৌম্বক ক্ষেত্র এর চারদিকে একটি আবরণ বা চৌম্বকস্তর তৈরী করে যা পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রাকার সংস্করণ মাত্র। চৌম্বকস্তর সূর্যের কার্যকলাপের জন্য প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। বুধের চৌম্বকস্তর এর ক্ষুদ্রাকারের জন্য পৃথিবীর চেয়ে দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে, যার ফলে বুধ পৃথিবীর চেয়ে ১০গুণ শক্তিশালী সৌর বায়ু উপস্থিতি খুব সহজেই সহ্য করতে পারে।

এই প্রচন্ড সৌরবায়ু ধীরে ধীরে বুধের আলোময় পার্শ্বে আঘাত করে। বুধের চৌম্বকক্ষেত্র এই সৌরবায়ুকে এর পৃষ্ঠে পৌঁছুতে দেয় না। অবশ্য সূর্য যখন খুবই সক্রিয় থাকে বা বুধ যখন অনুসূর অবস্থানে পৌছে, এই সৌরবায়ু ঠেকিয়ে রাখা চৌম্বক ক্ষেত্রের পক্ষে পুরোপুরি সম্ভব হয়ে ওঠে না। এরই মাঝে সৌরবায়ু এর ভূপৃষ্ঠে যেয়ে পৌছে এবং এর সক্রিয় প্রোটন বুধের পৃষ্ঠকে আঘাত করে। যখন এই প্রোটন ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে তখন এটি বুধের চৌম্বকস্তরের ভিতরে আটকা পড়ে যায়।

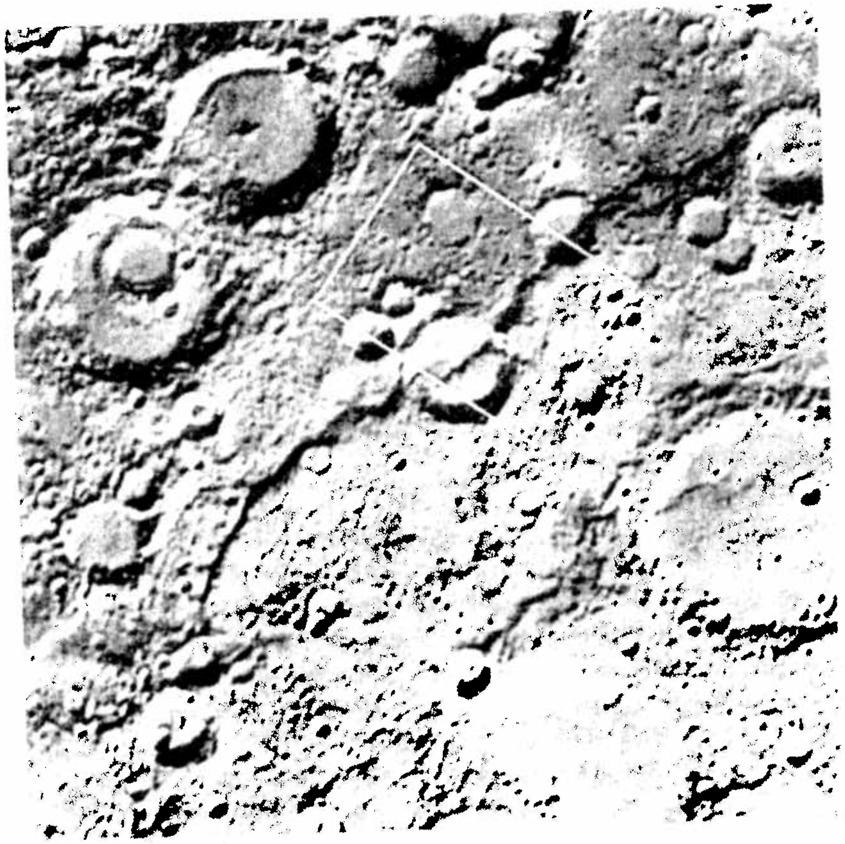

আবিষ্কৃত ফাটল ঃ (পাশের চিত্রের ভিতরে চিহ্নিত এলাকাটি এখানে দেখানো হয়েছে) ফাটলটি প্রায় ৫০০ কি. মি. বিস্তৃত এবং কোন কোন স্থানে প্রায় ২ কি. মি. উঁচু। ফাটলটি কোন কারণে প্রচন্ড চাপের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। ফাটল সৃষ্টির কারণ–বুধের কেন্দ্রের ঘনীভবন ও সংকোচন, তার ফলে বুধের পৃষ্ঠাঞ্চল কমে ছোট হয়ে আসে। এই সংকোচন তখনই সৃষ্টি হয় যখন পৃষ্ঠভাগের কোন অংশ অন্য অংশের উপর উঠে আসার চেষ্টা করে– আর এর অবধারিত ফলাফল এই চাপ সৃষ্ট ফাটল।

বুধের মত তপ্ত গ্রহের পক্ষে গ্যাসের অণু ধরে রাখা সম্ভব নয় (গ্যাসের অণুর মুক্তিবেগ বুধের মুক্তিবেগের চেয়ে বেশি)। এমনকি উদ্বায়ী পদার্থের একটি বিরাট পরিমাণও বায়ুমন্ডলে হারিয়ে যায়। ঠিক এই কারণেই দীর্ঘদিন যাবত মনে করা হয়েছিল যে বুধের নিজস্ব কোন বায়ুমন্ডল নেই। কিন্তু মেরিনার-১০এর অতিবেগুনী স্পেকট্রোমিটারের সাহায্যে বুধের আকাশে কিছু পরিমাণ হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও অক্সিজেনের উপস্থিতি সনাক্ত করা হয়েছে। আর পৃথিবী ভিত্তিক গবেষণা থেকে সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের উপস্থিতি সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে।

বায়ুমন্ডলের এসব পদার্থের উৎস ও ভাগ্য এক প্রাণবন্ত তর্কের সূত্রপাত করল। বুধের বায়ুমন্ডল থেকে গ্যাসের অণুগুলো ক্রমাগত বাষ্পীভূত হয়ে পুনরায় ভরে উঠেছে। বায়ুমন্ডলেই প্রধান অংশটি সম্ভবত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সৌরবায়ু দ্বারা তৈরী হয়েছে। বায়ুমন্ডলের কিছু

অংশ হয়তোবা চৌম্বকস্তর বা ধূমকেতুর উপাদান থেকে সরাসরি সংগৃহিত হয়েছে। যখনই কোন পরমাণু সৌরবায়ুর সাহায্যে বুধপৃষ্ঠে পতিত হয়, তখনই তা বুধের পাতলা বায়ুমন্ডলের অংশ হয়ে পড়ে। এমনকি এটাও সম্ভব যে গ্রহটি তখনও তার সৃষ্টির আদি অবস্থার উদ্বায়ী পদার্থ ধারণ করে রয়েছে।

বুধে পানি?

বুধ সম্পর্কে চমকে দেয়া অনেক খবর বিজ্ঞানীদের জানা থাকলেও বুধে পানি বা বরফের অস্তিত্বের কোন খবর তাদের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি ও জে.পি.এল (Jet Propulsion Laboratory. JPL)-এর একদল বিজ্ঞানী বুধের মেরু থেকে ফিরে আসা বৃত্তাকার পোলারাইজেশনের একটি রাডার রশ্মি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এই পর্যবেক্ষণের ফলাফলে বলা হয় যে বুধে পানি হতে তৈরী বরফ রয়েছে। বুধের মত উষ্ণ গ্রহে বরফ দূরে থাক কোন ধরণের পানির অস্তিত্বের কথা চিন্তাও করা যায় না। এর সম্ভাব্য কারণ হল বুধের ছায়াঘন মেরুতে স্থায়ীভাবে কিছু পানি রয়ে গেছে এবং এর উৎস সম্ভবত বুধের সৃষ্টির শুরুতে রয়ে যাওয়া কিছু পানি।

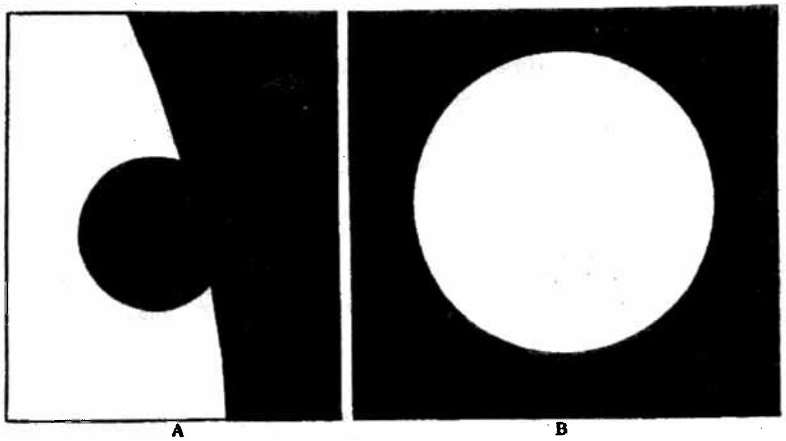

A B

বুধের ট্রানজিটের চিত্র ঃ (A) নভেম্বর ৬/১৯১৪ (B) নভেম্বর ১৪/১৯৫৩

যদি তাই হয় তবে বুধ সৌরজগতের পুরো সময়টা জুড়ে থাকা অসাধারণ স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের কোন গ্রহ যার মেরু কখনই সূর্যের দিকে তাকায়নি যদিও বুধে 'Caloris impact' এর মত ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়েছে। পানির উৎসের সম্ভাব্য আরেকটি কারণ হল বুধের পৃষ্ঠে প্রতিনিয়ত নিক্ষিপ্ত কোন ধূমকেতু। মেরুতে আটকে পড়া এ ধরণের পানি প্রায় সময়ই ছায়াতে নিমজ্জিত থাকায় এ থেকে খুব কমই বাষ্পীভূত হতে পেরেছে। এ ধরণের পানির উৎস বুধের বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের যোগান দিতে পারে। অন্যদিকে অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটির একদল বিজ্ঞানী মনে করেন যে, ছায়াময় মেরু অঞ্চলে অন্যান্য উদ্বায়ী পদার্থ যেমন- সালফার থাকতে পারে যা অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপমাত্রায় বরফের মত অনুরূপ রাডার প্রতিফলন পাঠাতে সক্ষম।

বুধে ম হা কা শ যা ন

কেন বুধ গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ পর্যবেক্ষণের বস্তু হিসাবে উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছে? বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহীদের কাছে এটি একটি বিরাট প্রশ্ন। এর প্রথম কারণ হল বুধের

সাথে চাঁদের চেহারার দিক থেকে বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়তঃ গ্রহাভিযান হিসাবে এটি মোটেই সুবিধাজনক অবস্থানে নয়। যেসব গ্রহে মহাকাশযান পাঠালে কম অভিজ্ঞতায় বেশি তথ্য পাওয়া যায়, নাসার বিজ্ঞানীরা প্রধানত সেসব গ্রহেই সন্ধানীযান পাঠাতে আগ্রহী, আর সেই হিসাবে বুধ রয়েছে সবচেয়ে অসুবিধাজনক অবস্থায়।

তৃতীয় কারণ হল অর্থনৈতিক। নাসার নীতি নির্ধারকরা মনে করেন বিজ্ঞানীরা এমন একটি মহাকাশ অভিযানের প্রস্তাব করবেন যা 'দ্রুত, ভাল, সস্তা', যার সাহায্যে কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব। বর্তমানে মহাশূন্যের গভীরতম স্থানে প্রেরণের জন্য 'ডিসকভারী' নামে একটি পরিকল্পনা নাসার বিবেচনায় রয়েছে যার জন্য খরচ পড়বে প্রায় ২২৬ মিলিয়ন ডলার, যা নাসা'র গ্যালিলিও ও ক্যাসিনি মিশনের খরচের (প্রতিটি ১ বিলিয়ন ডলার করে) চেয়ে অনেক কম।

বুধের কক্ষপথে মহাকাশযান প্রেরণের বিশেষ ধরণের কারিগরী সহায়তার-প্রয়োজন হবে। যেমন, মহাকাশযানকে সূর্য থেকে উত্থিত শক্তি বিকিরণকে প্রতিরোধ করতে হবে। এমনকি বুধের পৃষ্ঠ থেকে ফিরে আসা সৌরশক্তিও মহাকাশযানের জন্য ক্ষতিকর। কারণ মহাকাশযানটি যখন বুধের নিকটবর্তী হবে তখন 'বুধের আলো' (Mercury light) সরাসরি সূর্যের চেয়েও বেশি বিপদজনক। এধরণের বাধা সত্ত্বেও নাসা বুধের কক্ষপথে প্রেরণের জন্য ১৯৯৪ সালে 'ডিসকভারী মিশন' নামে একটি এবং ১৯৯৬ সালে দুটি অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

১৯৯৪ সালের প্রস্তাবটির নাম ছিল 'হারমেস '৯৪' যাতে গতানুগতিক হাইড্রোজেন-নাইট্রোজেন টেট্রাঅক্সাইড প্রপালসান ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়, যার জন্য ১১৪৫ কেজি ওজনের জ্বালানী বিস্ফোরকের প্রয়োজন হবে এবং এই জ্বালানীর অধিকাংশ খরচ হবে মহাকাশযানটিকে সূর্যের কাছে যেয়ে গতি কমানোর জন্য। নাসার বিজ্ঞানীরা এই জ্বালানীর পরিমাণ কমানোর জন্য প্ল্যানেটরী এনকাউন্টারের সংখ্যা (মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এড়ানোর জন্য) বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত এ ধরণের কার্যক্রম মহাকাশে সময়ের অপচয়ই শুধু বাড়িয়ে দেবে, বিশেষত যেখানে অবিরাম বিকিরণের জন্য কঠিন অবস্থায় ব্যবহৃত কিছু যন্ত্রাংশ-এর আয়ুষ্কাল কমে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এই অভিযানের জন্য বুধের প্রতিটি স্থানের মানচিত্র এক কি:মি. বা তার চেয়ে উঁচু বিভাজনে তৈরী করতে হয়েছে। এই ভৌগলিক মানচিত্র বুধের চৌম্বক ও মাধ্যাকর্ষণের সাথে তুলনামূলক হতে হবে। নাসা প্রাথমিকভাবে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে এটি বাদ দেয়া হয়।

১৯৯৬ সালে 'হারমেস'এর দলটি (JPL on Specatrum Astro Corporation in Gilbert. Arizona) একটি নতুন নকশা প্রস্তাব করেন যা অনেক কম জ্বালানী, কম খরচ ও কম সময়ে একই কাজ করতে সক্ষম। নতুন পরিকল্পনাটির নাম 'সৌরচালিত আয়ন চাপ ইঞ্জিন', যার জন্য মাত্র ২৯৫ কেজি জ্বালানীর প্রয়োজন হবে। এই যুগান্তকারী ইঞ্জিনটি সৌরশক্তিকে জেনন-এর (নিষ্ক্রিয় গ্যাস) আয়নে রূপান্তরিত করে বৈদ্যুতিক শক্তিক্ষেত্র দ্বারা উচ্চগতির মহাকাশযান তৈরী করবে। নতুন এই উদ্ভাবন 'হারমেস-৯৬' এর আন্তঃগ্রহ ভ্রমণের সময় 'হারমেস'৯৪'এর তুলনায় প্রায় একবছর কমিয়ে দেবে। কিন্তু তারপরও নাসা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়নি কারণ এই পরিকল্পনার জন্য যে সৌরবিদ্যুৎ প্রোপালসানের প্রয়োজন হবে তা পর্যাপ্ত জ্বালানীর রাসায়নিক ক্রিয়ার সমর্থন পাবে না। এমনকি এ ধরণের কোন ইঞ্জিনও ইতিপূর্বে তৈরী করা হয়নি।

অবশেষে নাসা বিস্তারিত আলোচনার জন্য ১৯৯৬ সালের 'ডিসকভারী মিশনের' আওতায় 'মেসেনজার' নামে একটি পরিকল্পনা বুধের কক্ষপথে প্রেরণের জন্য গ্রহণ করে। এটির পরিকল্পনা করেছিলেন মেরিল্যান্ডের-Applied Physics Laboratory, এতে 'হারমেস'৯৪'এর মত গতানুগতিক ধারার রাসায়নিক প্রপালসান ও একই ধরণের সেন্সর বহন করবে। তবে এতে দুটো বিশেষ যন্ত্রপাতি থাকবে যার সাহায্যে বুধের পাথরে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত উপাদানগুলোর পরিমাণ নির্ণয় সম্ভব হবে।

যন্ত্র দুটি বৈজ্ঞানিকভাবে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হলেও এদের জন্য যে অতিরিক্ত ভর মহাকাশযানে যুক্ত হবে তার ফলে একে বুধের কক্ষপথে যাওয়ার আগে শুক্রকে দুবার ও বুধকে তিনবার প্রদক্ষিণ করতে হবে। এ কারণে মহাকাশযানটি বুধে পৌঁছতে আরো অতিরিক্ত চার বছর সময় নেবে যা 'হারমেস'৯৬'এর সময়ের দ্বিগুণেরও বেশি। 'মেসেনজার' ডিসকভারী মিশনের মাঝে সবচেয়ে ব্যয়বহুল অভিযান (বর্তমান হিসাবে প্রায় ২১১ মিলিয়ন ডলার)।

প্রাতিষ্ঠানিক চুক্তি করার সময় 'ডিসকভারী মিশন' নাসার বাইরে কোন চিন্তা বা যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়ার গুরুত্ব আরোপ করে। নাসা এই পরিকল্পনার ভবিষৎ চিন্তার জন্য একটি আলাদা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই মিশনটি এখন "New Millennium Deep Space One" নামে তার কাজ শুরু করেছে। এই পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাবিত সকল যন্ত্রাংশ কিভাবে মহাকাশে কাজ করবে তারই প্রস্তুতি চলছে। ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে সৌরআয়ন চালিত 'Deep Space One' গ্রহাণু 'ম্যাকঅলিফি' সন্ধানীযানের সাথে (চ্যালেঞ্জারের নভোচারী ক্রিস্টিয়া ম্যাকঅলিফির নামানুসারে এর নাম রাখা হয়েছে) একই সাথে মঙ্গল ও ধূমকেতু ওয়েস্ট-কহুটেক-ইকামুরার দিকে তার তিন বছরের যাত্রা শুরু করবে। 'Deep Space One' সৌরবিদ্যুত প্রপালসান কার্যকারিতা প্রমাণ করবে বলে আশা করা যায়। যদি তাই হয় তবে সৌরশক্তি চালিত ইঞ্জিনগুলো আগামী শতাব্দীর প্রথমদিকের সকল মহাকাশযানে ব্যবহৃত হবে। আর আন্তঃগ্রহগুলোর জন্য এটি একটি বিরাট সুখবর, কারণ কেবলমাত্র ব্যয় সংকোচনের কারণে রহস্যময় বুধ দীর্ঘদিন যাবত মহাকাশ অভিযানে অবেহেলিত হয়ে আসছিল। হয়ত একদিন এই মৃত বিশ্ব মহাকাশযানের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. The Planets - Patrick Moore, Butler & Tanner Ltd. London.
2. Scientific American - Vol.277, Number 5, Nov. 1997.
3. Astronomy. The Evolving Universe - Micheal zeilik, Harper & Row Publishers, New York (1982)
4. বিশ্ব ও সৌরজগৎ - মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার,তথ্য ও প্রকাশনা অফিস, বুয়েট (১৯৮৬)।
5. Horizons- 3rd ed. - Micheal A.seeds. Wordsworth Publishing Company. California (1989)

পাঠচক্র

- ❒ বিষয় ঃ জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান
- ❒ আলোচক ঃ প্রকৌশলী সুকল্যান বাছাড়
- ❒ প্রতি শুক্রবার বিকাল ৪- ৬টা
- ❒ স্থান ঃ পুরাতন প্রশাসনিক ভবন, কক্ষ নং-১০৪

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), পলাশী, ঢাকা।

আয়োজক

বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশন

১০৮ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০।

ফোন ঃ ৯৬৬১০৪৭, ফ্যাক্স ঃ ৮১৪৬০৩, e-mail ঃ mohakash@bangla.net